উত্তরবঙ্গে যোগাযোগ

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দিশারী সংকল্প (বেলতলা পার্ক), বালুরঘাট, তুহিনশুভ্র মন্ডল, ৯৭৩৩২২৮৯৬৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, রাজা রাউত, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, ৯৪৩৪২১২০৮২, ৯৫৬৩৪১০২১৯

বিজ্ঞান অন্বেষক

জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি, একে বাঁচান; জলাশয় ভরাটের প্রতিবাদ করুন।

বর্ষ -৭ সংখ্যা - ৫ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর /২০১০ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

বিশ্ব উষ্ণায়ণ রোধে বিকল্প ব্যবস্থা

বিশ্বউষ্ণায়ণ রুখতে সারা পৃথিবী জুড়েই চলছে বিতর্ক, চলছে নানান আলোচনা। বিজ্ঞানীরা এজন্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি পুরানো প্রযুক্তিকেও নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা চলছে। মূল উদ্দেশ্য একটাই — তা হল, গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন রোধ। শক্তির ব্যবহার ও চাহিদা কমানো এবং দূষণমুক্ত শক্তির উৎসের ব্যবহারের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হতে পারলে তবেই এটি রোধ করা সম্ভব।

শক্তি সংরক্ষণ করতে হলে মোটর গাড়ির জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, আমাদের ভোগবাদী মানসিকতার পরিবর্তন, ব্যবসায়িক কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন এবং বিকল্প পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রতি নির্ভরশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানো দরকার।

বিকল্প এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎসের মধ্যে সৌরশক্তি, জোয়ার-ভাঁটা ও সমুদ্রশক্তি, ভূ-তাপজনিত শক্তি বায়ুশক্তি প্রভৃতির ব্যবহার ব্যাপক আকারে বাড়ানো দরকার।

কার্বন ব্যবহার কমানো, কার্বন শোষকের ব্যবহার বাড়ানো এবং কার্বন ঋণ বা কার্বনকর আরোপের ধারণাও জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে। ভাবা হচ্ছে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা, কারণ এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে শক্তি ও সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধির।

একনজরে বিশ্বউষ্ণায়ণ রোধে বিকল্প কিছু পন্থা

শক্তি সংরক্ষণ ঃ ভূ-উষ্ণায়ণ রোধ করতে হলে শক্তিসংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শক্তি সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

এরপর 2 পাতায়

ভারতীয় উপমহাদেশের পাখি

সবুজ রঙের ছোট একটি পাখি নদী, বিল, পুকুর বা যে কোন জলাশয়ের ধারে প্রায়ই ওড়াউড়ি করতে দেখা যায়, এর নাম বাঁশপাতি বা BEE-EATER। বাঁশের পাতার আকৃতির উজ্জ্বল চকচকে সবুজ বলেই এদের বাঁশপাতি বলে। এদের ৬টি প্রজাতি ভারতে দেখা যায়।

BEE-EATER (বাঁশপাতি) ORDER : CORACI FORMES FAMILY : *MERO PIDAE*

(১) GREEN / SMALL BEE-EATER ***(MEROPS ORIENTALIS LATHAM)***

বাঁশপাতি। দৈর্ঘ্য 16-18 সেন্টিমিটার।

Field Character : কচি ঘাসের মতো সবুজ এই ছোট্ট পাখিটির মাথাটি সোনালী বাদামী রঙের। গলায় কালো নেকলেসের মতো দাগ আছে। চোখের নিচ থেকে নেকলেস পর্যন্ত অংশ নীলাভ। ঠোঁট থেকে চোখ বরাবর কাজলের মতো কালো ডোরা আছে। ঠোঁটটি সরু, লম্বা ও নিচের দিকে একটু বাঁকা। এদের লেজের মাঝের পালক দুটি লম্বা সূচের মতো দেখতে লাগে। সব বাঁশপাতি পুরুষ ও স্ত্রী একইরকম দেখতে।

Distribution : 1000 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও মায়ানমারের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ডালের কাছাকাছি পোকামাকড় বেশি থাকায় এদের সংখ্যাও জলের ধারে বেশি। এমনকি সমুদ্রের কাছেও এদের পাওয়া যায়।

ছবি — পুষ্পল গোস্বামী

Habits : নামে BEE-EATER

এরপর 4 পাতায়

শিল্প ভাবনায় প্রফুল্লচন্দ্র

এ বছর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মের সার্ধশতবর্ষ। দেড়শত বছর আগে অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার রাঢ়ুলি-কাটিপাড়া গ্রামের জন্মেছিলেন যে ছেলেটি তিনিই পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিলেন বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী। 'মাস্টার অফ নাইট্রাইটস' নামে যিনি সমধিক পরিচিত। প্রফুল্লচন্দ্র শুধুই বিজ্ঞানী নন। বিজ্ঞান সাধনার সাথে সাথে পরাধীন ভারতের মুক্তির স্বপ্নও তিনি দেখতেন। প্রকৃতই একজন দেশপ্রেমিক। তদানীন্তন অনুন্নত সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজ সংস্কারের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। পরাধীন ভারতের দুর্বল শিল্প কাঠামো তাঁর মনকে উদ্বেল করত। তাই শিল্পের প্রসারেও ছিল তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা। দেশীয় শিল্পের উন্নয়নে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। পরাধীন ভারত শিল্পের দিক থেকে পিছিয়ে ছিল অনেকটাই। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অনেক জিনিসই তখন আমদানি করা হত বিদেশ থেকে। বিষয়টি প্রফুল্লচন্দ্রের মনকে নাড়া দিত সর্বদা। ঔষধপত্র, কাপড়চোপড়, কাঁচের বাসনপত্র এমনকি সূঁচটি

এরপর 3 পাতায়

বিশ্ব উষ্ণায়ণ

1 পাতার পর

আজকাল ঘরবাড়িতে তাপরোধক আবরণ, সি.এফ.এল বাল্ব বা ফ্লুরোসেন্ট বাতি, আমাদের পরিবহন মাধ্যমে কার্বন নির্ভরশীলতা কমানো প্রভৃতি হলো শক্তি সংরক্ষণের সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম। ব্যক্তি বা সংগঠন গুলির ক্ষেত্রে সরাসরি শক্তি ব্যবহার কমিয়ে দক্ষতা বাড়িয়ে শক্তি সংরক্ষণ করা দরকার যাতে খরচ কমানো যায় এবং পাশাপাশি একইসঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায়।

উন্নতদেশগুলোর বর্তমান জীবনযাত্রার মান শক্তি সরবরাহের প্রাচুর্যের উপর নির্ভরশীল। ঘরবাড়ি ঠান্ডা রাখা, গরম রাখা, অতিরিক্ত আলো জ্বালানো, দিনে সরকারী প্রতিষ্ঠানের পথবাতি জ্বালানো, অফিস-আদালতে অপ্রয়োজনীয় শক্তির অপচয় প্রভৃতি রোধ করতে পারলেই শক্তি সংকট তথা ভূ-উষ্ণায়ণ অনেকটাই মিটবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ বসবাস করেন, অথচ তারা বিশ্বের মোট শক্তি উৎপাদনের ২৫ শতাংশ খরচ করে এবং মোট 'গ্রিনহাউস' গ্যাসের ২৫ শতাংশ নির্গমন করে।

জমির ব্যবহার ঃ জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সঠিকভাবে করা দরকার — এতে পরিকাঠামো উন্নয়নের খরচ অনেকটাই কমে।

নবনগর ভাবনা (New Urbanism) এবং পরিবহনমুখী উন্নয়ন বিন্যাস (Transit Oriented development) এর মতো কিছু পদক্ষেপ, যাতায়াতের দূরত্ব কমানো, ব্যক্তিগত পরিবহন কমানো, জনসাধারণের পরিবহন ব্যবহার বিশেষকরে বিভিন্ন পদাধিকারীদের হেঁটে বা সাইকেলে যাতায়াতকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। ঘনসন্নিবিষ্ট এবং মিশ্র জমি ব্যবহার উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবহনের জন্য শক্তির প্রয়োজন কমবে। পরিবহনের মোটরচালিত গাড়ির বদলে অন্যান্য মাধ্যমের ব্যবহারের ফলে পেট্রোলিয়াম জ্বালানির খরচ কমে আসবে।

পরিবেশমুখী বাড়ির নক্সা ঃ পরিবেশের দিকে তাকিয়ে নতুন ধরনের বাড়ি নির্মাণ পদ্ধতির প্রচলন করা দরকার। যেমন, সক্রিয় সৌরভবন নির্মাণ, স্বল্পশক্তিভবন, শূন্যশক্তি ভবন নির্মাণ পদ্ধতি প্রভৃতি। বর্তমান বাড়িগুলোকেও শক্তি ব্যবহারের দিক থেকে আরও দক্ষ করে তোলা দরকার। এজন্য তাপ প্রতিরোধক ব্যবহার উচ্চ দক্ষতার সামগ্রীর ব্যবহার, জানালায় প্রতিফলক কাচ ব্যবহার প্রভৃতি। শহর এলাকায় অপেক্ষাকৃত হাল্কা রঙ ব্যবহার করা এবং বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব দেওয়া তাতে নগরাঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ফলে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের প্রয়োজন হবে না।

পরিবহন ঃ নতুন প্রযুক্তির বিদ্যুৎচালিত মোটর গাড়ি (প্লাগইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেইকল্ — PHEV), হাইড্রোজেন কার প্রভৃতির ব্যাপক ব্যবহারে খনিজ তেলের খরচ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড এর উদ্‌গীরণ উভয়ই একই সাথে কমানো যায়। বায়োডিজেল সহ অন্যান্য বায়োফুয়েল ব্যাপক ব্যবহার করা প্রয়োজন। বিমান পরিবহন ও মোটর পরিবহন-এর পরিবর্তে রেল পরিবহন এর নির্ভরশীলতা আরও বাড়ালে উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণ কমে আসবে যা ভূ-উষ্ণায়ণ রোধে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পারমানবিক শক্তি ঃ আজকাল পারমানবিক শক্তিকে জীবাশ্ম জ্বালানীর বিকল্প হিসেবে ধরা নিয়ে বহু বিতর্ক চলছে। বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত পরমাণু চুল্লী ব্যবহারের ফলে কম গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি হয়। (অবশ্য এটাও প্রমাণিত যে, পূনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির তুলনায় চার থেকে পাঁচ গুণ অধিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণ ঘটে।) এতে খানিকটা হলেও গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদন কম হয় — ফলে ভূ-উষ্ণায়ণ কিছুটা হলেও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু, ভূ-উষ্ণায়ণ কমের চেয়ে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয় দূষণের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায় এতে।

বি.বি.সি-র একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ফ্রান্স 2004 সালে তাদের শেষ কয়লা খনিটি বন্ধ করে দিয়েছে। এদের আরেকটি রিপোর্টে ২০০৭ সালে বলা হয়েছিল যে, শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্সের বাতাস সবচেয়ে বেশি পরিষ্কার। অপরপক্ষে, ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে বিদ্যুৎ সবচেয়ে সস্তা।

বাস্তবে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য থেকে বিকিরণের ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এবং জনস্বাস্থ্যহানী কয়েকশো গুণ বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক ব্যয় অনেকবেশি। ফলে অর্থ ও শক্তি উভয়েরই অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এমনিতেই, পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়টা খাতাকলমে যত সহজ বলে মনে হয় বাস্তবে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী প্রভাব এবং উৎপাদন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও কঠিন।

বস্তুতঃ পক্ষে পারমানবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের উন্নতির বদলে অবনতি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

বিকল্প শক্তির উৎস ঃ বিভিন্ন পূনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ানো দরকার। জলবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি, জোয়ার-ভাঁটা প্রভৃতির মতো বিভিন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে বেশি করে কাজে লাগানো দরকার। একমাত্র পুনর্নবীকরণযোগ্য এই শক্তির ব্যবহারে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা সম্ভব। বিশ্বের বহু দেশেই আমাদের দেশের মতো এখনও পেট্রোল ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানীর পেছনে বেশ ভালো পরিমাণে ভর্তুকি দেওয়া হয় সরকারী ভাবে। এই ভরতুকি এখন পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং পরিবেশ বান্ধব শক্তি উৎস-এর ক্ষেত্রে দেওয়া প্রয়োজন।

জীবাশ্ম জ্বালানির সাশ্রয় ঃ প্রাকৃতিক গ্যাস (যার অধিকাংশই মিথেন গ্যাস) শক্তির নিরিখে ইউনিট প্রতি খনিজ তেলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি করে। আবার পেট্রোল, কয়লার তুলনায় কম গ্যাস নির্গমন ঘটায়। একটি হিসেব অনুযায়ী পেট্রোলের তুলনায় 30 শতাংশ এবং কয়লার তুলনায় 45 শতাংশ কম কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি করে এই প্রাকৃতিক গ্যাস। তাই, প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারে বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ণ অনেকটা কমানো যেতে পারে।

কার্বন আবদ্ধকরণ এবং সঞ্চয় ঃ কার্বন আবদ্ধকরণ এবং সঞ্চয় (Carbon capture and storage – CCS) পদ্ধতির প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই

এরপর 4 পাতায়

প্রফুল্লচন্দ্র

1 পাতার পর

পর্যন্ত এদেশে উৎপাদিত হত না। আমদানি করা হত বিদেশ থেকে। নিত্য ব্যবহার্য এসব জিনিসের জন্য ভারত ছিল পরমুখাপেক্ষী। প্রফুল্লচন্দ্র একদমই বরদাস্ত করতে পারতেন না বিষয়টি। সর্বদাই ভাবতেন স্বাবলম্বী হওয়ার কথা। তাই কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে নিজের খরচ-খরচা চালিয়ে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকত তাই নিয়েই শুরু করেছিলেন রাসায়নিক কারবার। শুরু হল শিল্পোদ্যোগ।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ে দেশীয় শিল্পের দূর্দশা তাঁর মনকে বিচলিত করত। রূপসী বাংলার প্রকৃতিতে যে অজস্র সামগ্রী ছড়িয়ে রয়েছে তাকে কিভাবে শিল্পের উপাদান হিসেবে কাজে লাগানো যায় সেই চিন্তা তাঁকে আকূল করে তুলেছিল। শিল্পের প্রসার ঘটলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনাহারক্লিষ্ট যুবকদের মুখে অন্ন যোগানো যাবে এই স্বপ্নই দেখতেন তিনি। কাজও শুরু করে দিলেন। লেবুর বিশ্লেষণ করে তৈরি করলেন সাইট্রিক অ্যাসিড। কিন্তু ব্যাপারটি সুবিধাজনক হল না। কেননা তখনকার দিনে কলকাতায় লেবুর যোগান যেমন ছিল না তেমনি লেবু সস্তাও ছিল না। তাই লেবু থেকে তৈরি সাইট্রিক অ্যাসিড বিক্রি করে লাভের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। তাই ছেড়ে দিলেন সাইট্রিক অ্যাসিডের কারবার। ভাবতে বসলেন অন্য বিষয়ের কথা। এমন জিনিস তৈরি করতে হবে যাতে উৎপাদনের খরচ কম, বাজারে কাটতিও বেশি। ফলে লাভের অঙ্কও হবে বেশি। আবার আর্থিক ব্যাপারটিও ভাবতে হবে। মূলধন কম লাগে এমন জিনিস উৎপাদনের কথাও ভাবতে হবে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত ভেষজ বা ওষুধ সংক্রান্ত দ্রব্য তৈরির দিকেই ঝুঁকলেন।

সে সময় ফসফেট অফ সোডা এবং সুপার ফসফেট অফ লাইম আমদানি করা হত বিদেশ থেকে। প্রফুল্লচন্দ্রের বিষয়টি ধাক্কা দিল। তিনি দেখলেন, যে গবাদি পশুর হাড়গোড় থেকে এসব জিনিস তৈরি হয় তা তো এদেশেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এদেশ থেকে সেগুলি বিদেশে রপ্তানী করা হয়। তাহলে এসব দ্রব্য এদেশে তৈরি করা যাবে না কেন? শুরু হল প্রচেষ্টা। হাড়ভস্মকে কাজে লাগানো হল। সালফিউরিক অ্যাসিডের সহযোগে তৈরি হল সুপার ফসফেট অফ লাইম। এর সঙ্গে সোডার প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হল ফসফেট অফ সোডা। তৈরি হল এক আশ্চর্য টনিক। এরকম আরও অনেক রাসায়নিক দ্রব্য যা এতদিন পর্যন্তও বিদেশ থেকে আমদানি করা হত তা প্রফুল্লচন্দ্র নিজের প্রচেষ্টায় এ দেশেই তৈরি করতে সফল হলেন। ক্রমে ক্রমে গড়ে তুললেন এক ওষুধের কারখানা — বেঙ্গল কেমিক্যালস্ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্।

বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে শিল্পোদ্যোগী হবার আহ্বান প্রফুল্লচন্দ্রের চিরাচরিত। চাকুরীর আশায় বসে না থেকে বঙ্গসন্তানেরা ব্যবসার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে নিজের পায়ে দাঁড়াক এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই অন্নবস্ত্রহীন হাজার হাজার ছেলেকে নিরাশ চোখে কলকাতা শহরের এদিক থেকে ওদিকে 'হা চাকরি হা চাকরি' করতে করতে ঘুরতে দেখে তাঁর মন দুঃখে ভরে যেত। তিনি বলতেন — 'ভারতবাসী এখনও ঘোরো, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়ে মন দাও, তবে যদি বাঁচতে পারো নইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নেই।'

— রতন দেবনাথ, ০৩৩-২৮৫২৩৬৭০

সৌর সুনামি

চিন্তার বিষয়, নাকি দুশ্চিন্তার?

২০০৪ সালের সেই ভয়ানক সুনামির কথা আমরা কোনওদিন ভুলতে পারবো না। এখন এই সুনামি নাম শুনলেই যেন আমাদের মনের মধ্যে দিয়েও একটা সুনামি বয়ে যায়। পৃথিবীর বুকে এক বিরাট ছাপ ফেলে দেওয়া এই 'সুনামি' নামটা এখন পৃথিবী ছাড়িয়ে চলে গেছে সূর্য পর্যন্তও। এবছর আগস্ট মাসের ১ তারিখ সূর্যেও ঘটে গেল সুনামি। তবে এ সুনামি পৃথিবীর সুনামির থেকে অনেকটা ভিন্ন, বহু লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালীও। এতটাই বেশি শক্তিমান যে এর প্রভাব আমাদের পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌছেছে। তাহলে ভয়ের কোন্য কারণ আছে কি? তাহলে কি পৃথিবী আবার কোনও মহাজাগতিক বিপদের মুখে পরলো? এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের একদম মূল থেকে শুরু করতে হবে।

প্রথমে আমাদের মানতে হবে, কি এই সৌর সুনামি? সূর্যের কেন্দ্রে ক্রমাগত ফেটে চলেছে লক্ষ লক্ষ টন হাইড্রোজেন বোমা। চারটি হাড্রোজেন পরমাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় একটি হিলিয়াম পরমাণু। এই সংযুক্তির ফলে বিপুল পরিমাণ বিধ্বংসী শক্তি উৎপন্ন হয়। এটিই হাইড্রোজেন বোমার মূলনীতি আর এই বিক্রিয়াই সূর্যে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে পরিমাণ শক্তিশালী পরমাণু বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, একটি সাধারণ হাইড্রোজেন বোমা তার থেকে প্রায় ছয় গুণ বেশি শক্তিশালী। সূর্যের কেন্দ্রে প্রতি সেকেন্ডে এইরকম প্রায় ৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন বোম ক্রমাগত বিস্ফোরণ হয়। সৌরকেন্দ্রে উৎপন্ন এই বিরাট পরিমাণ শক্তি প্রায় ৭ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যখন সৌরপৃষ্ঠে এসে পৌছয় তখন এই শক্তি বিরাট দৈত্যাকার আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণের মত ফেটে বেরিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ এইরূপ অগ্ন্যুদগীরণের পরিমাণ ভীষণ বেড়ে গেলে এবং তার উচ্ছ্বাস স্বাভাবিকের তুলনায় যথেষ্ট বেশি হয়ে পড়লে তখন তাকে সৌর ঝড় বলা হয়। এইরূপ কোনও সৌরঝড় যদি আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে তখন সেটি হয় সৌরসুনামি।

এই ১ আগস্টের সৌর সুনামির প্রভাব ৪ আগস্ট পৃথিবীতে পড়েছে। NASA-র SUN DINAMIC OBSERVATORY (SDO) -র বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, এই বিরাট সৌর সুনামির প্রভাবে সূর্য থেকে একটা বিশাল মাত্রায় প্লাজমা (আয়নিত অণু) নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি। প্রভাব পড়েছে মেরু প্রদেশে এবং তার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। এর প্রভাবে মরুজ্যোতির প্রভা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মেরুজ্যোতি নিজের অক্ষাংশ থেকে কিছুটা সরে গেছে। প্লাজমার প্রভাব মেরুপ্রদেশের পাশ্ববর্তী অঞ্চলের আয়নোস্ফিয়ারে পড়ছে যার ফলে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে আপাতত জানা গেল তেমন ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ভবিষ্যতে এই সৌর সুনামি

এরপর 5 পাতায়

উপমহাদেশের পাখি

1 পাতার পর

হলেও মৌমাছি ছাড়াও ফড়িং, মাছি প্রভৃতি নরম (বর্মহীন) পোকা খায়। উড়ন্ত পোকার পিছু নিয়ে তাকে ধরে ফেললেও সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলে না। কোথাও বসে শিকারের মৃত্যু নিশ্চিত করে তবেই খায়। এদের ডাক অনেকটা টিট্‌ টিট্‌ ট্রি ট্রি ট্রি।

Nesting : ফেব্রুয়ারি থেকে মে। নদীর পাড়ে, মাটি বা বালির ঢিপিতে ভূমির সমান্তরালে গর্ত (Tunnel) করে এরা বাসা বাঁধে। গর্তের শেষে ডিম পাড়ার জায়গাটি (Egg Chamber) তুলনামূলক বড় হয়। সব বাঁশপাতির ডিমই ধবধবে সাদা ও নিখুঁত গোল, পুরুষ-স্ত্রী উভয়ই সন্তান প্রতিপালন করে।

(২) **CHESTNUT-HEADED BEE-EATGER** (*MEROPS LESCHENAULTI VIEILLOT*): লাল/লালশির বাঁশপাতি। দৈর্ঘ্য 18-20 সেন্টিমিটার।

Field Character : এরাও সবুজ, তবে পেট ও লেজ নীল। গলা ও মুখ হলুদ, ঠোঁট কালো, গলায় নেকলেসের মতো দাগ ও মাথা লাল (Chestnut), বাচ্চাদের রঙ কিছুটা হাল্কা হয়। লেজে সুচের মতো সরু পালক থাকে না।

Distribution : উত্তর-পূর্ব ভারত, তরাই, পশ্চিমঘাট পর্বত অঞ্চলের আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্য ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এদের বসবাস। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে এরা অনুপস্থিত। এছাড়া শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও মায়ানমারেও এদের দেখা মেলে।

Habits : অন্যান্য বাঁশপাতির মতো। এরা টি-টিউ টি-টিউ করে ডাকে।

Nesting : ফেব্রুয়ারী থেকে মে। অন্যান্য বাঁশপাতির মতো। এদের মাঝে মাঝে ছোট কলোনীতেও দেখা যায়।

(৩) **BLUE-BEARDED BEE-EATER** (*NYCTYORNIS ATHERTONI*) : বড় বাঁশপাতি। 31-34 সেন্টিমিটার।

Field Character : এরা সবচেয়ে বড় বাঁশপাতি। হাল্কা হলুদ বুকের উপর সবুজ ছিট ছিট পালক আছে। গলায় নীল রঙের পালক দাড়ির মতো লাগে। বাচ্চাদেরও এই নীল দাড়ি খুব স্পষ্ট। ডাকার সময় এই পালকগুলি ফুলে ওঠে। লেজে সূচের মতো লম্বা পালক দুটি অনুপস্থিত।

Distribution : উত্তর-পূর্ব ভারত, ওড়িষা, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে এদের দেখা মেলে।

Habits : অন্যান্য বাঁশপাতির মতো।

Nesting : ফেব্রুয়ারী থেকে আগস্ট। বাকী বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বাঁশপাতির মতো।

(৪) **BLUE TAILED BEE-EATER** (*MEROPS PHILIPPINUS LINNAEUS*) : লাল লেজ বাঁশপাতি। দৈর্ঘ্য ২৩-২৬ সেন্টিমিটার।

Field Character : এরা একটু বড় সবুজ বাঁশপাতির মতো দেখতে। চোখের কালো ডোরার উপর নীচে হাল্কা নীল এবং লেজ নীল রঙের।

Distribution : এরা 20° উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে শীতকালে এবং উত্তরে গ্রীষ্মকালে অবস্থান করে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মায়ানমারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়। এরা প্রধানত ছোট ছোট দলে থাকে।

Habits : সবুজ বাঁশপাতির মতো। তবে যেখানে গাছের সংখ্যা বেশি ও জলের উপস্থিতি আছে সেই স্থান এদের খুব পছন্দ। এরা টি-টিউ টি-টিউ করে ডাকে।

Nesting : মার্চ থেকে জুন। বাকী বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বাঁশপাতির মতো।

(৫) **BLUE-CHEEKED BEE EATER** (*MEROPS PERSiCUS PALLAS*) : দৈর্ঘ্য 24-26 সেন্টিমিটার।

Field Character : সবুজ বাঁশপাতির মতো। গলা হাল্কা হলুদ ও বাদামী। চোখের ডোরার উপর নীচে হাল্কা নীল।

Distribution : গুজরাট ও পাকিস্তানের গ্রীষ্মকালে প্রজননের জন্য আসে।

Habits : অন্যান্য বাঁশপাতির মতো।

Nesting : এপ্রিল থেকে আগস্ট। বাকী বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বাঁশপাতির মতো।

(৬) **EUROPEAN BEE-EATER** (*MEROPS APASTER*) : দৈর্ঘ্য 23-25 সেন্টিমিটার।

Field Character : অনেকটা Chestnut Headed বাঁশপাতির মতো দেখতে। গলা হলুদ, বুক ও পেট নীল। পিঠ সোনালী হলুদ। এদের লেজের সরু সূচের মতো পালক দুটি ছোট। বাচ্চাদের রঙও যথেষ্ট স্পষ্ট।

Distribution : মূলত দক্ষিণ পাকিস্তানের বাসিন্দা, তবে উত্তর-পূর্ব কাশ্মীর ও উত্তর পাকিস্তানের গ্রীষ্মকালীন পরিযায়ী।

Habits : অন্যান্য বাঁশপাতির মতো।

সমস্ত বাঁশপাতি বেশ ছটফটে ও উজ্জ্বল রঙের হয়। অনেক সময় দেখা যায় এরা গলা ও বুকের পালক ফুলিয়ে বসে আছে। এভাবে সরাসরি সৌরশক্তি (তাপ) গ্রহণ করে এরা। বেশিরভাগ পাখিই এভাবে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

— কল্যাণ কুমার রায়, ৯৪৩৩৫৭০৭০৪

বিশ্ব উষ্ণায়ণ

2 পাতার পর

আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। তাপ বিদ্যুৎ-এর মত বড় বড় কেন্দ্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমন শতকরা ৮০-৯০ শতাংশ কমানো সম্ভব। এই পদ্ধতিতে আবদ্ধ কার্বনকে ভূ-স্তরের গভীর খাদে এবং গভীর সমুদ্রে খনিজ কার্বোনেট হিসেবে সঞ্চয় রাখা যায়। IPCC-এর বিশ্বাস আগামী ২২০০ সালের মধ্যে এই পদ্ধতিতে শতকরা 10-55 ভাগ কার্বন প্রশমন করা সম্ভবপর হবে।

সামাজিক বনসৃজন ঃ ব্যাপক পরিমাণে সামাজিক বনসৃজন করা প্রয়োজন রয়েছে। একটি গাছ কাটলে (পরিণত) অন্ততঃ বদলে আরও দুটি গাছ নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত লালনপালন করা প্রয়োজন যাতে বেঁচে থাকার হার শতকরা একশ ভাগ হয়।

উপরিউক্ত পথ ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই আমাদের — একই গতিবেগে বর্তমান পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী ২১০০ সালের মধ্যে আনুমানিক ২০ থেকে ৩০ শতাংশ প্রজাতিকে আমরা হারাতে বাধ্য থাকবো — তখন কিন্তু কিছু করার থাকবে না আমাদের।

— রাজা রাউত, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

অক্টোপাসের ভবিষ্যদ্বাণী!

অক্টোপাস পল। কোনও খেলোয়াড়ের নাম নয়। একটি সামুদ্রিক প্রাণী। এযাবৎ ১৪টি খেলার ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, যার মধ্যে মিলে গিয়েছে ১২টি। ২টি মাত্র ভুল। পুরুষ অক্টোপাসটির জন্ম ২০০৮ সালে — ওয়েমাউথের সি লাইফ সেন্টার-এ (ইংল্যান্ড) রাখা একটি ডিম থেকে। পুরো নাম পল অ্যালেন দ্য অক্টোপাস। বর্তমান ঠিকানা জার্মানির ‘সি লাইফ ওবারহোসে’ নামক একটি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সে। ঐ সামুদ্রিক প্রাণী প্রদর্শন কেন্দ্রর বিনোদন বিভাগের ডাইরেক্টর ড্যানিয়েল ফে-র কথায় শৈশবেই প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল অক্টোপাস পল — সে দর্শকদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকত যা অন্য অক্টোপাসের মধ্যে দেখা যায় না। দর্শকরা এগিয়ে গেলে সে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাত। তখন থেকেই সে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তার বেশিরভাগ ভবিষ্যদ্বাণী জার্মানির ফুটবল ম্যাচ নিয়ে। তার সামনে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের দুটি বাক্স রাখা হত। একটি বাক্সে আঁকা থাকত জার্মানির জাতীয় পতাকা। অন্যটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের জাতীয় পতাকা। দুটি বাক্সেই রাখা হত পলের পছন্দসই খাবার। কিছু সময় বাদে পল গিয়ে বসত কোনও একটি বাক্সের ওপর। আর ধরে নেওয়া হত, ওটাই ওর ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্কেত। ইউরো — ২০০৮ টুর্নামেন্টে জার্মানির ৬টি খেলার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল ঐ পদ্ধতিতে। ৪টি মিলে যায়। ২টি ভুল হয়। বিশ্বকাপ ২০১০-এ ৮টি খেলায় (জার্মানির ৬, অন্য দলের ২) ভবিষ্যদ্বাণী করে। সব ক'টি মিলে যায়। পলকে দিয়ে তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণী করাবার নেপথ্যে জুয়াড়ি বা বুকিদের হাত ছিল কিনা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বীকে চাপে ফেলার জন্য জার্মানি দলেরই একটি কৌশল ছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। আরেকটি ব্যাপার হল সেমি ফাইনাল আর ফাইনাল ছাড়া পলের ভবিষ্যদ্বাণীর খবর খেলার আগে সেভাবে জানা যায়নি। প্রায় সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীই ছিল জার্মানির খেলা নিয়ে, যে খেলাগুলিতে জার্মানি ছিল ফেভারিট। সেইসব খেলায় একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া পল জার্মানিকেই সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে বেছেছিল এবং ইউরো-২০০৮-এর ২টি ম্যাচ বাদ দিলে সব কটিই সে মিলিয়ে দিয়েছে। যে ২টি ম্যাচ নিয়ে হৈ চৈ হয়, বিশ্বকাপের সেমি ফাইনালে জার্মানি বনাম স্পেনের খেলায় স্পেন এবং ফাইনালে নেদারল্যান্ডস বনাম স্পেনের খেলায় স্পেনকে বেছে নেওয়া। প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীই মেলার সম্ভাবনা ছিল ৫০ শতাংশ। একটি মুদ্রা নিয়ে হেড, টেল বলার মত ব্যাপার। শিকাগোর ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ফিল্ড মিউজিয়ামের গবেষক জ্যানেট ভয়ট বলেছেন, জার্মানির পতাকার রঙ অক্টোপাসকে চিনিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ অক্টোপাস রঙ চেনে না। রঙ দেখে পছন্দ করার কোনও ঘটনা ঘটেনি। বাঙ্গর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেলাগ ম্যালহ্যামের বক্তব্য, পল রঙ না চিনলেও পতাকার উজ্জ্বলতার তফাত ধরতে পারে — এ ছাড়া সে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল বড় ও টানা সরলরেখার উপস্থিতি বুঝতে পারে। ‘ডেইলি মেল’-এর পল কনোলির ভাষায়, পল যে জার্মান, স্প্যানিশ এবং সার্বিয়ার পতাকা আঁকা বাক্সে গিয়ে বসেছিল তার কারণ ওগুলোর প্রত্যেকটিতেই লম্বা টানা বড় বড় আনুভূমিক সরলরেখা আছে। আর জার্মানিকে ছেড়ে সার্বিয়া বা স্পেনকে বেছে নেবার ক্ষেত্রেও পতাকার উজ্জ্বলতা ছাড়াও আনুভূমিক রেখার তফাতগুলিই কাজ বেশি করেছে। জার্মানির পতাকার চেয়ে স্পেন বা সার্বিয়ার পতাকার সরলরেখাগুলি বড় আর উজ্জ্বল। জার্মানির ইংকফিশ আর্কাইভের সাথে যুক্ত গ্রিফসওয়ার্ল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ভোলকার মিস্কে বলেছেন, পতাকার পশ্চাৎপটে ব্যবহৃত রাসায়নিকের তারতম্যই সম্ভবত পলের পছন্দের ক্ষেত্রে বেশি কাজ করেছে। প্লাস্টিক বাক্সে পতাকা আঁকার জন্য যে রঙ ব্যবহার করা হয়েছিল, তার গন্ধও প্রভাবিত করে থাকতে পারে পলকে। অক্টোপাস গন্ধ শোঁকে তার ৮টি পা দিয়ে। পলও এর ব্যতিক্রম নয়। যে বাক্সের গন্ধ সে আগে পেয়েছে, ভালো লেগেছে — তার ওপরেই চড়ে বসবে এটাই স্বাভাবিক।

— তপন চন্দ, ৯৭৩৩১৫৩৬৬১

সৌর সুনামি

3 পাতার পর

নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহল যথেষ্ট চিন্তিত। হার্ভার্ড স্মিথসোনিয়াম সেন্টার ফর অ্যাসট্রোফিজিক্সের গবেষক লিওন গোলাব জানিয়েছেন যে , সাম্প্রতিককালে এই প্রথম পৃথিবীতে কোনও সৌরঝড়ের প্রভাব পরলো। সুতরাং বৈজ্ঞানিকদের হাতে সৌর সুনামির পৃথিবীর ওপর প্রভাবের কোনও অতীতের তথ্য নেই। তবে ২০০১ সালে শেষ পাওয়া সৌরঝড়ের (যদিও তার কোনও প্রভাব পৃথিবীতে পরেনি) তথ্য আর এই সৌরসুনামির তথ্যের উপর ভিত্তি করে SDO-র বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে আগামি দু-তিন বছরের মধ্যে এর থেকেও বড় সৌরসুনামি ঘটতে পারে যার প্রভাবে হয়তো ক্ষতি হতে পারে কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর, বিচ্ছিন্ন হতে পারে সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, ঘটতে পারে বিরাট বিদ্যুৎ বিভ্রাট। বৈজ্ঞানিকেরা এবিষয়ে কোনও সঠিক তথ্য এখনই না দিতে পারলেও তারা একদিক থেকে আরো একটি বিষয়ে চিন্তিত আছেন। তারা বলছেন এত দিন কোনও সৌরঝড়ের প্রভাব পৃথিবীতে পরেনি কারণ, কোনও সৌরঝড়ে কোনও দিন এতটা প্লাজমা নিক্ষেপ হয়নি। এইবার এমনকি হল যে হঠাৎ এত পরিমাণ পজমা বেরিয়ে এলো? তাহলে ভবিষ্যতে বিপদ আরো ঘনীভূত হচ্ছে? হয়তো ভবিষ্যতে এতটা আর নাও হতে পারে। সুতরাং পরবর্তী সৌরসুনামি পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। তার আগে কোনও সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়।

— কিঞ্জল কুমার বিশ্বাস, ৯৩৩০৫৫৯৭৭৩

জলাভূমি বাঁচাতে প্রচার কর্মসূচি

১৯৭২ সালের ৫ জুন থেকে সারা পৃথিবীতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়ে থাকে। পরিবেশ আজ ভীষণভাবে বিপন্ন। পরিবেশ রক্ষার জন্য বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিকস্তরে সম্মেলন ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও পরিবেশ আজ ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে। পরিবেশকে সুস্থ ও নির্মল রাখতে জলাভূমির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। জলাভূমি প্রতিমুহূর্তে চুরি হয়ে যাচ্ছে, রাতারাতি ভরাট করে প্রোমোটাররা বাড়ি বানিয়ে সরকারি আইন ও পুলিশকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। অথচ পরিবেশকে বাঁচাতেই হবে। তাই জলাভূমিগুলি ঠিকঠাক রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই জরুরি। জলাভূমিগুলির বিকাশ ঘটলে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে। ডিম ও মাছের যোগানও বৃদ্ধি পাবে, পরিবেশের উষ্ণায়ন অনেক হ্রাস পাবে।

জলাভূমি ও পরিবেশকে বাঁচানোর লক্ষ্যে কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, বিজ্ঞান অন্বেষক ও নীলকুঠি ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশনের কর্মীরা জুন-জুলাই মাস ধরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ ও জলাভূমি নিয়ে সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি; লিফলেট প্রচার, পুস্তিকা প্রকাশ, বক্তৃতা, সভা, সমীক্ষা ইত্যাদির আয়োজন করেছিলেন।

সম্প্রতি নীলকুঠি সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলে, বাবুরহাট রামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলে, মাথাভাঙা পারাডুবিতে সেমিনার ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রশ্নোত্তরপর্বে জানতে চাওয়া হয় যে নিজস্ব অঞ্চলের পুকুরগুলি কেমন আছে? সমীক্ষায় জানা যায় কোচবিহার শহরের চন্দনদীঘি, পদ্মদীঘি, রাজমাতাদীঘি, বাদুরবাগান দীঘিগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। গত ৪/৫ বছরে সরকারি উদ্যোগেই মরাপোড়া দীঘি, খালাসীপট্টি দীঘি, রাজবাড়ির বেশ কয়েকটি ঝিল বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে মুস্তাফীদীঘি প্রায় বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। শহরের লাগোয়া মরাতোর্যা নদী দীর্ঘদিন কোনও সংস্কারই হয়নি। শহরের প্রতিটি দীঘিই জৈববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও প্রায় অবহেলিত। দীর্ঘদিন বাদে লালদীঘি সংস্কার হলেও তার আয়তন হ্রাস পেয়েছে। পাড়ে সবুজ ঘাস নেই। ফলে জৈববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সাল প্রতি বছরে গড় তাপমাত্রা কোচবিহার শহরে ১ থেকে ১.৫° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে, গড় বৃষ্টিপাত কমেছে ৩০-৫০ মিলিমিটার। সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অন্যান্য দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলাভূমি সংরক্ষণের প্রশ্নে প্রচার সভায় দেবব্রত চাকি বলেন, জলাভূমি বাঁচাতে সরকারিস্তরে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। পাশাপাশি বক্তা নদীচুরির উল্লেখ করেন। শ্রীচাকি জানান, শহরের নিকাশী ব্যবস্থা নেই, জল সর্বত্র দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজকর্মী মানিক কৈরী জানান, সর্বস্তরে বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জলাভূমির প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হবে। স্কুলের প্রচার সভায় শিক্ষিকা সুনন্দা কর, শিক্ষক অমিতাভ চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। শ্রীচক্রবর্তী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জৈব বৈচিত্র্যসংরক্ষণ, দীঘির সংস্কার সহ পরিবেশ রক্ষার বিষয়গুলি তুলে ধরেন। ধারাবাহিক প্রচার কর্মসূচিতে বিজ্ঞানকর্মী জয়দেব দে, গোকুল সাহা, প্রদীপ কৈরী প্রমুখ জলাভূমি বা পুকুর ভরাট কিভাবে রুখবেন, জলাভূমি ভরাট রোধে আইন ব্যবস্থা সহ সারা বিশ্বে জলাভূমির গুরুত্বের কথা ও রামসার কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক স্তরে জলাভূমির গুরুত্বের কথা ব্যাখ্যা করেন। বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশিত 'জল দূষণ ও তার প্রতিকার' পুস্তিকাটি ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করা হয়।

— *নিজস্ব প্রতিবেদন*

বলাগড়ের শুশুক

আগে বিকেলে ঘুরতে যেতাম সাইকেল নিয়ে শিবপুরের ঘাটে। এখনও মাঝে মাঝে যাই। গেলে যে জিনিসটা সবার আগে চোখে পরে তা হল (শুশুক এক জলচর প্রাণী)। চূর্ণি আর গঙ্গার মিলনস্থলে স্রোতে ওরা অবিরাম আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। ওদের জলে চলা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। কোন মানুষকে কামড়ায় না। প্রত্যেক দিন বিকেলে ওঠে এই শুশুক। এই স্থানে শীতকালে পিকনিকের আসর বসে। সবাই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে এই শুশুক জলে ভাসার খেলা। কিন্তু হঠাৎ আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে এই শুশুকগুলি আমরা আগামী দিনে দেখতে পাব তো? কারণ, এর পাশেই রয়েছে যে চর। সেখানে তৈরি হবে ৩৫০ মেগাওয়াট-এর ক্ষমতা সম্পূর্ণ থার্মাল পাওয়ার স্টেশন। আর এখানে থার্মাল পাওয়ার স্টেশন হলে যে উত্তপ্ত গরম জল ছাড়া হবে তার জল এখানের সমস্ত মাছ, শুশুক তাপ-এ সরে যাবে বা মরে যাবে।

পরিশেষে বলতে পারি যে, তবে প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। আগামী বছরগুলিতে মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কেউ বসবাস করতে পারবে তো?

— *শুভদীপ বাইন,*
৭৮৫১৩৫১৬৬২

বিপন্ন শকুনদের নিয়ে তথ্যচিত্র

ভালচারস্ ইন্ রানি' নামে একটি তথ্য চিত্র তৈরি হচ্ছে। উদ্যোক্তা ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। 'ড্রিমস্ আন্‌লিমিটেড' নামে অসমের শীলচরের একটি সংস্থা দায়িত্বে রয়েছে। অসমের রানি, হরিয়ানার পিঞ্জর ও পশ্চিমবঙ্গের রাজাভাতখাওয়া — এই ৩টি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে (বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট) শুটিং হবে।

এরপর 7 পাতায়

মজার সংখ্যা ৬১৭৪

সংখ্যার জগতে অনেক মজার মজার সংখ্যা আছে। এইসব সংখ্যার অনেকগুলির আবিষ্কারক ভারতীয়রা। রামানুজনের কথা তোমরা সবাই জান। এমনকী ১৭২৯ সংখ্যাটার সাথেও তোমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। কিন্তু ৬১৭৪ এই সংখ্যাটা আমার মনে হয় তোমাদের কাছে একেবারেই নতুন। সংখ্যাটা দেখতে সাদামাটা হলেও খুব মজার। এটা একটা ধ্রুবক সংখ্যা। ভাবছ সেটা আবার কী। বেশ একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

একটা চার অঙ্কের যে কোনো সংখ্যা খাতায় লিখে ফেল। শুধু খেয়াল রাখবে সংখ্যাটায় যেন একই অঙ্ক একবারের বেশি না থাকে। ধরা যাক, তোমার লেখা সংখ্যাটা ২৬১৮। এবার সংখ্যাটাকে অধঃক্রমে সাজালে আমরা পাব ৮৬২১

এখন এই সংখ্যাটাকে উল্টে লিখলে হবে ১২৬৮। এবার বড় সংখ্যাটা থেকে ছোট সংখ্যাটা বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে ৮৬২১ — ১২৬৮ = ৭৩৫৩

এই নতুন সংখ্যাটা নিয়ে আবার আগের মত একই প্রক্রিয়া করে যেতে হবে অর্থাৎ, ৭৩৫৩ কে অধঃক্রমে সাজালে হবে ৭৫৩৩, উল্টে লিখলে ৩৩৫৭ এবং সংখ্যা দুটির অন্তরফল হবে ৭৫৩৩ — ৩৩৫৭ = ৪১৭৬

একইভাবে ৪১৭৬ সংখ্যা থেকে পাওয়া যাবে, ৭৬৪১ — ১৪৬৭ = ৬১৭৪

৬১৭৪ সংখ্যাটা নিয়ে একই প্রক্রিয়া করলে আমরা বারবার একই সংখ্যা '৬১৭৪' পাব। তাই ৬১৭৪ কে বলা হয় ধ্রুবক সংখ্যা। যে কোনো চার অঙ্কের সংখ্যা ৯ (সংখ্যাটাতে একটা অঙ্ক একবারই থাকবে) নিয়ে উপরের প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করলে সর্বক্ষেত্রেই আমরা ৬১৭৪ সংখ্যাটা পাব।

এই সংখ্যাটা যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি একজন ভারতীয়, নাম দত্তরাজ রামচন্দ্র কাপ্রেকর। তাই এই সংখ্যাটাকে বলা হয় কাপ্রেকারের ধ্রুবক (Kapreker's constant)। এই সংখ্যাটি সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কাপ্রেকারের প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল। এছাড়াও তিনি নানারকম অঙ্কের ধাঁধা, ম্যাজিক বর্গ ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। ম্যাজিক বর্গগুলির মধ্যে 'কোপারনিকাস ম্যাজিক', 'মহাত্মা গান্ধী শতাব্দী বর্গ', 'স্বাধীনতা বর্গ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০৫ সালের ১৭ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের দানু জেলায় কাপ্রেকারের জন্ম। কাপ্রেকারের পিতা ছিলেন রেভিনিউ অফিসের একজন করণিক। ছোটবেলা থেকেই গণিতের প্রতি কাপ্রেকারের আসক্তি ছিল প্রবল। বন্ধুরা যখন মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করতে কাপ্রেকরকে তখন ঘরে বসে একমনে অঙ্কের নানা ধাঁধার সমাধান খুঁজে বেড়াতে দেখা যেত। গণিতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি রেঙ্গলার আর পি পরাঞ্জপে মেথামেটিক্যাল পুরস্কার পান। গ্র্যাজুয়েট হবার পর তিনি গণিতের শিক্ষক হিসেবে নাসিক এর কাছে দেবলালি অঞ্চলের একটি স্কুলে যোগ দেন। শিক্ষকতা করার সাথে সাথে তিনি সংখ্যা নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে থাকেন।

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে কাপ্রেকর ইহলোক ত্যাগ করেন। মার্টিন গাউনার-এর পুস্তকে তাঁর কাজগুলি প্রকাশিত হবার পর বিশ্ব দরবারে উচ্চ প্রশংসিত হয়। *— কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়,*

৩৭এ, সেন্ট্রাল রোড, ফ্ল্যাট-৩এ, যাদবপুর, কল- ৩২

বিপন্ন শকুনদের নিয়ে তথ্যচিত্র

6 পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণী ও বন সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান মুখ্য বনপাল এস. বি. মণ্ডল জানিয়েছেন, 'শকুন বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এদেরকে বাঁচানোর জন্য বনদপ্তর নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কলকাতার সল্টলেক, বাঁকুড়া, সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গের কিছু জায়গায় শকুন চোখে পড়ে। শকুনদের বাঁচাতে রাজাভাতখাওয়ায় শকুন প্রজননকেন্দ্র তৈরি হয়েছে।

শকুন কেন বিপন্ন ঃ (১) মুম্বাই ন্যাচারাল হিসট্রি সোসাইটির বিজ্ঞানী ডঃ বিভু প্রকাশ-এর মতে, ডাই ক্লোফেনাক নামে একটি ওষুধ দায়ী। এটি শকুনের কিডনিকে বিকল করে দেয়। পশু চিকিৎসায় এটি অ্যান্টি ইনফ্লামাটারি ড্রাগ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৯০ সালে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যথা-যন্ত্রণানাশক ওষুধ হিসাবে বাজারে আসে। তখন থেকেই শকুনদের বিপন্নতা শুরু। ২০০৪ সালে শকুনের মৃত্যুর পিছনে ডাইক্লোফেনাক-এর ভূমিকার কথা প্রথম জানা যায়। ২০০৬ সালে গবাদি পশুর ব্যথার ওষুধ হিসাবে ডাইক্লোফেনাক-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ব্যথানাশক এই ওষুধ (ইনজেকশন)টি প্রয়োগ এখনও বন্ধ হয়নি।

(২) শকুনদের বাসস্থানের তীব্র সমস্যা। খাদ্যাভাব ও তীব্র। বহু জায়গায় শকুনদের খাবার মিলছে না, গবাদি পশুর মৃতদেহ বাইরে ফেলে রাখলে সমস্যা হয় না, কিন্তু বর্তমানে গবাদি পশুর মৃতদেহ সবাই মাটিতে পুঁতে দেন। পৃথিবীতে মোট ২২টি প্রজাতির শকুন রয়েছে। ৯টি প্রজাতি ভারতে রয়েছে। লুপ্তপ্রায় প্রজাতি গুলি হল'— (১) হোয়াইট ব্যাকেড় ভালচারস্, (২) লং বিল্ড ভালচারস্, (৩) স্লেনডার বিলড্ ভালচারস্।

— তথ্য ঃ জয়দেব দে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার- উত্তরবঙ্গ সংবাদ (১৮ আগস্ট ২০১০)

বিজ্ঞান সাধক -এর ১১৫তম জন্মবার্ষিকী পালন

গত ১ আগস্ট ২০১০ তারিখে গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি ও উত্তরপাড়ার শিশুভবন বিদ্যাভবনের যৌথ উদ্যোগে বিদ্যাভবনে প্রয়াত বিজ্ঞানসাধক, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ড. গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যর ১১৫তম জন্মবার্ষিকী (জন্ম - ১ আগস্ট ১৮৯৫) উদ্‌যাপিত হয়।

সভায় সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথির আসনগ্রহণ করেন যথাক্রমে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ড. সত্যব্রত দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ড. তারকমোহন দাস এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ড. সুমিত্রা চৌধুরী।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরে বিদ্যাভবনের এরপর ৪ পাতায়

চিঠিপত্র

মহাশয়,

আমার শ্রীমান কর্তৃক সংগৃহিত 'বিজ্ঞান অন্বেষক' বর্ষ-৭, সংখ্যা-৩ পেলাম। উক্ত সংখ্যার প্রতিটি লেখাই অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ। পত্রিকাটি পড়ে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়, তৎসহ বহু বিষয়ে চেতনা জাগ্রত করে। এককথায় একাই একশো। আপনাদের সংগঠন ও পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক হতে ইচ্ছুক। সংগঠন ও পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক ভালবাসা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদ সহ —
সীতারাম জ্যোতিষী
চৌপথী (সুপার মার্কেট), আলিপুরদুয়ার

কিভাবে চিঠি লিখবেন

• কাগজের একপিঠে লিখবেন। • হস্তাক্ষর অবশ্যই অপরের বোধগম্য হতে হবে। • সহজ ভাষায় লিখবেন।

আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি,
— সম্পাদক

মহাশয়,

'বিজ্ঞান অন্বেষক' পাঠাবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কবি বিষ্ণু দে-র কথায় 'বয়স হয়েছে ঢের পেনসনই তো পঁচিশ বছর'। আমার পেনশন ২৫ বছর না হলেও ২৩ বছর। ফলে মন মোটামুটি মননশীল হলেও শরীরের দিকে হাঁটু ভাঙা 'দ'। তাই আপনাদের সহযোগিতা করবার ইচ্ছা 'ইচ্ছাই থেকে যায়।

১৯৭৫ সাল থেকে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের বই প্রকাশনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেবার পর আরও বেশ কিছু জনপ্রিয় বিজ্ঞানের প্রকাশনায়ও আমার একটা ভূমিকা ছিল।

আপনাদের ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে-জুন ২০১০-এ অ্যালার্জির অ্যানাটমির বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন লেখা প্রত্যাশা করেছিলাম।

একটা অনুরোধ, কৃষকদের জ্ঞানসমৃদ্ধ করবার জন্য কীটনাশক ওষুধের কুফল এবং সুফল নিয়ে প্রাঞ্জলভাবে কিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে যদি প্রকাশ করেন তবে দেশের উপকার হয়। পত্রিকার সমৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদ সহ —
সুধীর ভট্টাচার্য
২৯, সন্তোষপুর কো-অপারেটিভ সোসাইটি
কলকাতা-৬৬

বিজ্ঞান সাধক জন্মবার্ষিকী পালন

7 পাতার পর

প্রধান শিক্ষক শ্রী গৈরিক গঙ্গোপাধ্যায় অতিথিদের পরিচিত করান এবং সকলকে স্বাগত জানান। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির সম্পাদক দেবব্রত মণ্ডল গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বর্ণনা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে ড. দাস গোপাল চন্দ্রের কীট-পতঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য মনোজ্ঞভাবে বলেন। বিশিষ্ট অতিথি ড. সুমিত্রা চৌধুরী গোপালচন্দ্রের ভৌতিক আলো সম্পর্কিত গবেষণা এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্রের সঙ্গে গোপালচন্দ্রের পরিচয় হবার ঘটনা বলেন। তিনি আরো বলেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় গোপাল চন্দ্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ড. সত্যব্রত দাশগুপ্ত গোপাল চন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ড. তারকমোহন দাসের পিঁপড়ের জীবনদর্শন তথ্য চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

প্রতিবেদক — কাজল রায়, ৯০৫৯৫৮৬২৩৭

চিচিং ফাঁক

সংকলন- তপন চন্দ

• সব কিছুতে বুঝবে কারণ
প্রশ্ন করতে শেখা চাই।
বিশ্বাসকে যাচাই কোরো
যুক্তি ছাড়া গতি নাই।

• পূজা মানত ব্রত পালন
শিক্ষিতরাও করছে লালন,
সমাজের এই পিছন হাঁটা
রুখতে পারে আমজনতা।

• মন্ত্রশক্তি কিংবা দোয়া
দৈব ওষুধ স্বপ্নে পাওয়া,
এসব শুধুই গল্প কথা
রোগ সারাবার নেই ক্ষমতা।

• ক্ষেত খামারে কলে মিলে
পরিশ্রমী যেই জন।
সকাল বিকাল যোগ-প্রাণায়াম
রামদেব নেই প্রয়োজন।

• কোক পেপসি বিষে ভরা
শরীর স্বাস্থ্য পয়সা নষ্ট।
শচীন-শাহরুখ করুক টাকা
বাড়িওনা নিজের কষ্ট।

• অন্যজনকে আংটি পাথর
নিজের বেলায় বিজ্ঞাপন,
জ্যোতিষীদের ধান্দাবাজি
বুঝবে কবে জনগণ?

যোগাযোগ — বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো ঃ কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৮৪৬০৭৭৭, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২ ।

সম্পাদক মণ্ডলী — অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। (ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in